The Great Choice for Exciting Viewing Pleasure

ORSON
colour television

SUKANTA

56, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA-700 071. INDIA.
PHONES · 44-0254, 43-2606
34, ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA-700 020.
PHONE : 47-7977
SUKANTA Burnpur Road, Court More, Assansol
SUKANTA Hill Cart Road, Siliguri, Phone 21144
SUKANTA Nachan Road, Benachity, Durgapur,
Phone 2499

CAMPAIGN/SKL-CT/P1-87

দেশ

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ □ ৬ জুন ১৯৮৭ □ ৫৪ বর্ষ ৩২ সংখ্যা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

এম· জে· আকবর □ বিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষাপট □ ২৯

এই দেশ এই বিশ্ব

অমল মুখোপাধ্যায় □ মুক্তি কোথায় আছে □ ৮৩
অরুণ বাগচী □ মেষ শাবক ও নেকড়েগুলি □ ৭৫
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় □ আফগানিস্তানে হলুদ বৃষ্টি □ ৭৭

বিদেশের চিঠি

মদনগোপাল মুখোপাধ্যায় □ হৃদয় পরিবর্তনের কাহিনী □ ৫৭
মানব মিত্র □ আট বছর পরের এক দিন □ ৯৮

অ্যালবাম

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় □ জয়যাত্রা □ ৮৮

ব্যঙ্গ কৌতুক

রূপদর্শী □ ঝাঁকিদর্শন □ ১৮

নিবন্ধ

কুন্তলা লাহিড়ি □ বীরহোর : আরণ্যক উপজাতির কথা □ ৬৫

খেলা

অশোক রায় □ ক্রিকেট পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনী □ ৯১
গৌতম ভট্টাচার্য □ খেলার খুচরো খবর □ ৯৪

ধারাবাহিক রচনা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় □ দানব ও দেবতা □ ৪৯

ধারাবাহিক উপন্যাস

সমরেশ বসু □ দেখি নাই ফিরে □ ১৯
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় □ পূর্ব-পশ্চিম □ ৭১

গল্প

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় □ অজযুদ্ধ □ ৪৪
নীলা কর □ বাস্তু সাপ □ ৫২

কবিতা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় □ শান্তিকুমার ঘোষ
সোমক দাস □ শান্তি সিংহ
রমানাথ ভট্টাচার্য □ রেজাউদ্দিন স্টালিন □ ১৬

নিয়মিত

চিঠিপত্র □ ৭ □ সম্পাদকীয় □ ১৫ □ সাহিত্য □ ৮৬ □
গ্রন্থলোক □ ১০৭ □ শিল্পসংস্কৃতি □ ১০১ □
পঞ্চাশ বছরের রচনাপঞ্জী □ ১১৩ □ অরণ্যদেব □ ৯৫

প্রচ্ছদ

সুনীল শীল □ সন্দীপ ভট্টাচার্য

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক
৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
বিমান মাশুল . ত্রিপুরা ২০ পয়সা পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা

বীরহোর : আরণ্যক এক উপজাতির কথা

কুন্তলা লাহিড়ি

ছোটনাগপুরের মালভূমি-জঙ্গলের উপজাতিগুলির অন্যতম হল বীরহোর। ছোট্ট এই উপজাতিটি চিরকালই অনাদৃত। শ'খানেক বছর আগে তনাদীন্তন ব্রিটিশ শাসকবর্গের দৃষ্টি এদের ওপর প্রথম পড়ে। শোনা গিয়েছিল এরা নাকি নরখাদক, এমনকি মরণোন্মুখ মা-বাবার মৃত্যু ত্বরান্বিত করে তাদের মাংস খেতেও এরা দ্বিধা করে না। কর্নেল ডালটন, ছোটনাগপুর ডিভিশনের সেকালের কমিশনার, ১৮৬৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে লিখছেন যে, ওদের এই প্রথা বহুকাল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্যাডিংটন সাহেব ১৮৫৫ সালে এদের উল্লেখ করেছেন "মাংকি পিপল্", হিন্দুস্তানীতে "বান্দর লোগ" হিসেবে। ক্যাপটেন ডেপ্রী ১৮৬৮ সালে

বীরহোরদের কী আমরা
মিউজিয়মে সাজানো দ্রষ্টব্যবস্তু
হিসেবেই চিরকাল রেখে দেবো ?
আমরা কী দেখবো না যাতে পুষ্টির
অভাবে বীরহোর শিশুগুলি
অকালে মারা না যায় ?

ছোটনাগপুরের ভূপ্রাকৃতিক জরিপ করতে গিয়ে একদল বীরহোরের আসামের চা-বাগানে চলে যাওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করেন। তবে বীরহোরদের প্রথম বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় ছোটনাগপুরের পালামৌ সাব-ডিভিশনের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার ও সেটলমেন্ট অফিসার ফরবেস সাহেবের ১৮৭২ সালের রিপোর্টটি থেকে। এখানে তার কিছু অংশ তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না।

"The Birhors are probably one of the earliest settlers in the hills and forests of the Chotanagpore country; they are not confined to Palamou, but are found scattered over the hills in Hazareebaugh and Chotanagpore. Though wild, they are a very harmless race. They are to be found

শেষ বিকেলের একটি অলস মুহূর্ত

living only on the tops and spurs of the hills, cultivating absolutely nothing and living exclusively on monkeys, birds, jungle roots and herbs."

'তবে ইংরেজ প্রশাসকদের এ ধরনের ভাসা-ভাসা বিবরণের চেয়ে অনেক বেশি তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা পাওয়া যায় এই শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত শ্রীশরৎচন্দ্র রায়ের "দি বীরহোর" বইখানিতে। সাম্প্রতিককালেও এই উপজাতিদের নিয়ে বেশ কয়েকজন গবেষণামূলক কাজকর্ম করেছেন।

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বীরহোররা এই অঞ্চলের অন্যান্য উপজাতি, যেমন সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, ওঁরাও প্রভৃতিদের নিকটাত্মীয়। এদের চেহারাও অনেকটা এসব উপজাতিভুক্তদের মত, অর্থাৎ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, ছোটখাটো আকার, লম্বাটে মুখ, ঢেউখেলানো চুল ও চওড়া নাক। এমনকি এদের ভাষাও সাঁওতালি ও মুন্ডারির এক অদ্ভুত মিশ্রণ। বীরহোরদের নিজেদের মতে, এক মুন্ডা ভাই ও বোনের অবৈধ মিলনের ফলে এই উপজাতির সৃষ্টি। গোষ্ঠী ও পরিবার থেকে বিতাড়িত এই দম্পতি জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কোনমতে খাদ্য সংগ্রহ করে প্রাণধারণ করতে বাধ্য হয়। অন্যান্যদের থেকে এই বিচ্ছিন্নতা তাদের মধ্যে গড়ে তোলে জঙ্গলের সঙ্গে এক নিবিড় নির্ভরশীলতার সম্বন্ধ।

"বীরহোর" শব্দটির আক্ষরিক অর্থই হল "আরণ্যক"। প্রকৃত অর্থেই এরা জঙ্গলের সন্তান, এদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, এমনকি এদের ঘরবাড়িও যেন জঙ্গলকে ভিত্তি করে, জঙ্গলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। ছোটনাগপুরের উঁচুনীচু মালভূমির পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব অংশে, প্রায় সত্তর মাইল লম্বা ও কুড়ি মাইল চওড়া এক অঞ্চলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট দলে বীরহোরদের বাস। তবে এরা যাযাবর ধরনের, এক জায়গায় দীর্ঘদিন কখনোই স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। এরা মূলত শিকারী, তবে জঙ্গলের ফলমূল ও অন্যান্য উপকরণও সংগ্রহ করে থাকে। শাল, মহুয়া, গামহারের এই বনাঞ্চল এক সময়ে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীতে পূর্ণ ছিল। এই পরিবেশই বীরহোরকে পরিণত করেছে এক সুদক্ষ শিকারীতে যার ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রবল, এবং বন্যপ্রাণীদের আবাস ও অভ্যাস সম্পর্কে যার জ্ঞান সুনিবিড়। দারুণ শীতের পর এসব অঞ্চলে আসে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রখর রোদ। আবার বর্ষায় জঙ্গলের মধ্যে চলাফেরা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে বলে জঙ্গলের ধারে মোটামুটি একটা খোলা জায়গা বেছে নিয়ে এরা কটা মাস কাটায়। বর্ষাই এদের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন সময়।

লতাপাতা ও ডালপালা দিয়ে তৈরি এদের পর্ণকুটির, বা কুম্বা, ছোট কুটিরগুলি চি-কুম্বা, বড়গুলি ঘর-কুম্বা। কুম্বাগুলি প্রায় ছ ফুট উঁচু, মোচার মত আকৃতি। দরজার বদলে মাটির কাছে ফুট দুই আড়াই-এর একটা ফুটো, জানালার কোন বালাই নেই। এর ভেতরেই

বীরহোর নারী ও শিশু

বীরহোর পরিবারগুলি তাদের বাচ্চাকাচ্চাসহ রাত্রি কাটায়, এর ভেতরেই এদের দু-একটি সামান্য পার্থিব সম্পত্তি সযত্নে রক্ষিত। বর্ষাকালে রান্নাও হয় এরই ভেতরে। পরিবেশের সঙ্গে বীরহোরদের সম্পর্ক যে কত নিবিড় তা এই কুম্বাগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। কুম্বাগুলির আয়তন নিতান্তই ছোট, যেমন ছোট পাখির বাসা কিংবা জন্তুজানোয়ারদের গুহা। কুটিগুলিকে প্রকৃতির কাছ থেকে বীরহোরদের যে নিম্নতম চাহিদা, তার প্রতীক বললে ভুল হবে না। ছোট হলে কী হবে, জঙ্গলের হিংস্র জন্তুদের আক্রমণ থেকে বীরহোরদের বাঁচাতে এগুলি বেশ কাজ দেয়। লক্ষ্য করার বিষয় যে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী আরেকটি খাদ্যসংগ্রহকারী উপজাতি, এস্কিমোদের ঈগলুর সঙ্গে বীরহোরদের কুম্বাগুলির আকৃতিগত মিল কী প্রবল। অবশ্য পরিবেশের তারতম্যে দুটি ক্ষেত্রের কুটির নির্মাণের মালমশলার একেবারে আকাশ-পাতাল তফাৎ ঘটেছে। দশ-বারোটি ছোটবড় কুম্বা নিয়ে তৈরি এক একটি গ্রাম বা টান্ডা। কুম্বাগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ানো, তবে মোটামুটি ইংরেজি "S" অক্ষরের ধাঁচও চোখে পড়ে। প্রতিটি টান্ডা হল এক একটি খাদ্য-দল (Food group)। যার আয়তন নির্ভর করে পরিবেশের প্রাকৃতিক উপকরণ ও সম্ভাবনার ওপর। টান্ডাগুলি সাধারণত অবস্থিত হয় কোনো গ্রাম ও জঙ্গলের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়, দুয়েরই প্রান্তে, সম্ভবত মূল জনজীবনের সঙ্গে বীরহোরদের প্রান্তিক অবস্থানেরই প্রতীক হিসেবে। আবার এমনও হতে পারে যে, জঙ্গল ও গ্রাম—বেঁচে থাকার লড়াইতে এই দুয়ের ওপরেই বীরহোরদের যে নির্ভরশীলতা, এই অবস্থান তারই প্রতিফলন মাত্র।

বোঝাই যাচ্ছে বীরহোররা এখনও পড়ে আছে সংস্কৃতির একেবারে নীচের ধাপে। দশ-এগারোটি পরিবারের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এরা ঘুরে বেড়ায়। জঙ্গলের একপ্রান্তে সপ্তাহখানেক বা সপ্তাহ দুয়েকের জন্য বাসা বাঁধে। সেখান থেকে আবার অন্য কোনো অংশে খাবারের সন্ধানে চলে যায়। এভাবে তারা ঘুরতে থাকে, এবং বছর দুয়েকের মধ্যে যেখান থেকে এই পরিক্রমণ শুরু হয়েছিল সেখানেই ফিরে আসে। এখান থেকে একই বা সামান্য ভিন্ন পথে আবার শুরু হয় তাদের যাত্রা। জঙ্গলের হরিণ, খরগোশ, বনমোরগ, তিতির প্রভৃতি মেরে, বাঁদর ধরে, ফলমূল সংগ্রহ করে চলে এদের টিকে থাকার প্রাত্যহিক কঠিন সংগ্রাম। তারই মাঝে জঙ্গল থেকে 'চোপ' লতা খুঁজে পেতে এনে তা থেকে দড়ি তৈরি করার এক কৌশল এরা উদ্ভাবন করেছে। এই জংলি লতা জলে ভিজিয়ে, পিটিয়ে আঁশ বার করে শক্তভাবে পাকিয়ে যে দড়ি তৈরি হয়, তা কাছাকাছি গ্রামে বিক্রি করে বা বিনিময়ের মাধ্যমে এদের দৈনন্দিন জীবনের নুনটুকুর যোগাড় হয়। দড়ি বানানোর এই পেশার সূত্রপাত নিয়েও বীরহোরদের এক লোককথা প্রচলিত আছে। তা অনেকটা এরকম : তিন বীরহোর ভাই জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে রামগড় অঞ্চলে এসে পড়ে। একদিন এই অঞ্চলের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবার পথে একজনের পাগড়ি একটা গাছের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ব্যাপারটা অশুভ মনে করে সে সেখানেই থেকে যায়, অথচ তার অন্য দুই ভাই তাকে ছাড়াই চলে যায় এবং যুদ্ধে জয়ী হয়। তারা ফিরে দ্যাখে যে প্রথমজন সেই চোপ লতার ছাল কাটতে ব্যস্ত। ভাইরা তাকে 'বীর হোর' 'চোপ-কাটিয়ে' বলে ব্যঙ্গ করলে সে বলে যে, এমন দুর্মুখ ভাইদের সঙ্গে থাকার বদলে সে বরঞ্চ "বীরহোর'-ই থাকবে এবং জঙ্গলে রাজত্ব করবে। এভাবেই বীরহোরদের মধ্যে বংশানুক্রমে চোপ লতার সাহায্যে দড়ি বানানোর পেশা প্রচলিত হয়।

তবে দড়ি বানানোর চেয়ে বীরহোরদের ঢের বেশি প্রিয় জীবিকা হল শিকার, এমনকি এখনও যখন ছোটনাগপুরের বিখ্যাত জঙ্গলের অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। তা সত্ত্বেও জীবনযাত্রার ধরনে বীরহোরদের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। এর ফলে বীরহোর উপজাতি দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথম গোষ্ঠী হল উথলু বা ভুলিয়া, যারা প্রকৃত যাযাবর, কখনোই এক জায়গায় বেশিদিন কাটায় না। দ্বিতীয় গোষ্ঠী হল জাখী বা থানিয়া, যারা বেশ কিছুদিন হল কোনো পাহাড়ের গায়ে বা জঙ্গলের প্রান্তে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। জাখী বীরহোরদের কেউ কেউ জঙ্গল সাফ করে স্থায়ী চাষাবাদও শুরু করেছে, তবে এদের বেশির ভাগই ভূমিহীন এবং শিকার ও দড়ি তৈরি করে জীবিকা অর্জন করে। জাখীদের কুম্বাগুলিও অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের মাটির দেওয়াল ও পাতায় ছাওয়া, মেঝেও সামান্য উঁচু। সামান্য কিছু দানাশস্য বা ভুট্টার চাষ করলে কী হবে, জাখী বীরহোরেরাও বহুদিন এক জায়গায় থাকতে পারে না। ডিসেম্বর মাসে ফসল তোলার পর এরাও চলার নেশায় গা ভাসিয়ে দেয়, শিকার করে দিন কাটিয়ে বর্ষার ঠিক আগে আবার টাণ্ডায় ফিরে আসে।

গৃহকর্মে ব্যস্ত বীরহোর ঘরণীরা

বীরহোর নববধূ, দূরে সুলতানা গ্রাম

তুলনামূলকভাবে উথলু বীরহোররা বেশি আদিম, অন্যান্য সংস্কৃতির থেকে বেশি বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে চোপ লতার দড়ি ও তালপাতার চাটাই আশপাশের গ্রামে বিক্রি করতে গিয়ে এরাও বহির্পৃথিবীর সংস্পর্শে আসে। ফলে দেখা যায় যে, বীরহোর সংস্কৃতিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাদের ভেতর থেকেই গড়ে ওঠেনি, বরঞ্চ অন্যদের প্রভাবে তৈরি হয়েছে। পোশাক ও ব্যবহার্য নানারকম জিনিসপত্রেও তার ছাপ দেখা যায়। আজকের বীরহোর খুব কমই ভগোয়া নামের লেঙট পরে, সে ধুতি ও লুঙ্গি পরতে শিখেছে। বীরহোর রমণীরাও শুধুমাত্র লাহাঙ্গার সাহায্যে লজ্জানিবারণের বদলে শাড়ি-ব্লাউজ পরছে। জাঘী-উথলু নির্বিশেষে ব্যবহার করছে সস্তা অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্র, যদিও মধ্যে মধ্যে মাটির ও কাঠের পাত্রও অল্পস্বল্প চোখে পড়ে। তবে ভাত ও শাক এখনও এদের প্রধান খাদ্য। আশ্চর্যের কথা এই যে মূলত শিকারী হলেও এদের খাদ্য তালিকায় মাংস বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। এর কারণ একান্তই অর্থনৈতিক। হাজারিবাগ শহরের অদূরবর্তী সুলতানা গ্রামের কাছাকাছি টান্ডা-র বাসিন্দা বীরসাই-এর হিসেব অনুযায়ী একটা খরগোশের দু কেজি মাংসের বদলে পাওয়া যায় পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা। তাই দিয়ে বেশ কয়েক কেজি চাল হয়। বেশি চাল মানেই পেটভরে আরও কটা দিন খেতে পাওয়া। অনিশ্চিত শিকারের খোঁজে সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটনি থেকে মুক্তি। আর ভাত মানে হাঁড়িয়াও, ওদের প্রিয় পানীয়। কিন্তু পুষ্টির অভাবে বীরহোরদের গড় আয়ু অত্যন্ত কম, পঞ্চাশের ওপরে বয়স এমন মানুষ যে কোনো টান্ডায় খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রধানত এই কারণেই ছোট এই উপজাতির সংখ্যা কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র তিন কী চার হাজারে।

প্রতিটি টান্ডায় একজন করে প্রধান থাকেন, তাঁকে বলা হয় নায়া। ইনি একাধারে পুরোহিত ও গ্রামপ্রধানের কাজ সম্পন্ন করেন। ইনিই গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। গ্রামবাসীদের শিকারে ডাকা প্রভৃতি কাজকর্ম করার জন্য নায়া একজন কোতওয়ার বা দিগুয়ার ঠিক করেন। মাটির ভূমিকা কিন্তু আলাদা। তথাকথিত আধিভৌতিক ক্ষমতা দিয়ে ইনি অশুভ আত্মাদের দূর করেন এবং দলের সৌভাগ্য রক্ষা করেন। এতো গেল সামাজিক সংগঠনের কথা। সামগ্রিকভাবে বীরহোর উপজাতিটি কতকগুলি গোষ্ঠীতে (clan) বিভক্ত। প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব টোটেন (toten) আছে। কোন বীরহোর কখনওই সজ্ঞানে, ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের টোটেনকে শিকার করবে না। একই টোটেম-গোষ্ঠীর ভেতরে বিয়ে নিষিদ্ধ। তবে এই গোষ্ঠী সংগঠনের সামাজিক গুরুত্ব ছাড়া কোনোরকম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য নেই। বিয়ে বা বাৎসরিক পূজা প্রভৃতি সামাজিক বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই গোষ্ঠীপ্রথার কাজকর্ম সীমাবদ্ধ। এদের উত্তরাধিকার প্রথা কিন্তু অনেকটা হিন্দুদেরই মত। পারিবারিক সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়।

বীরহোরদের বিয়ের ব্যাপারটি বেশ চিত্তাকর্ষক। বিয়েথার মত সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত শুকনো ঋতুতে হয়। কন্যাপণের বিষয়টি দুই পরিবারের বয়স্করা মিলে ঠিক করেন। নির্ধারিত দিনে গ্রামের সকলে জঙ্গলের ধারে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। সমবেত মন্ত্রপাঠের পর মেয়েটি হঠাৎ জঙ্গলের দিকে ছুটতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু নেয় ছেলেটি। গ্রামবাসীরা নিশ্চল হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে যায়। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ছেলেটি মেয়েটিকে ধরে ফেলে। তখুনি জঙ্গলের মধ্যেই দুজনে মিলিত হয়। একত্রে গ্রামে ফিরে আসার পর মেয়েটির কপালে সিঁদুর লাগিয়ে দেয় ছেলেটি। নতুন শাড়ি ও ফুলে মেয়েটিকে সাজানোর পর শুরু হয় পান ও ভোজন, সঙ্গে চলে মেয়েদের সম্মিলিত দং, লাগ্রে বা মটকার নাচ। ছেলেরা তাদের লম্বাটে ঢোল টুমডা বা মান্দার এবং বিশালাকৃতি গোল টমক বা নাগেরা ঢোল বাজাতে শুরু করে। পাহাড় ও উপত্যকার মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে যায় উৎসবের মেজাজ।

তবে অন্যান্যভাবেও বিয়ে ঘটতে পারে। ছেলে ও মেয়ে ভালবেসে পালালে শেষ পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া ছাড়া অভিভাবকদের গত্যন্তর থাকে না। কোনো পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করলে তাও গ্রহণযোগ্য। কখনও কোনো নারী কোনো পুরুষের ঘরে একঝুড়ি মহুয়া ফুল বা একগোছা জ্বালানি কাঠ নিয়ে জোরজার করে ঢুকে পড়লে এবং কয়েকদিন কাটালে তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা ছাড়া পুরুষটির কোনো উপায় থাকে না। আবার পণ ছাড়া বিয়ের ঘটনাও আশ্চর্য নয়। লক্ষণীয় বিষয় হল যে, সামগ্রিকভাবে বিয়ের ব্যাপারটিতে বীরহোরদের মধ্যে তেমন কোনো কঠিন সামাজিক নিয়ম নেই। এমনকি তুতো ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ের ঘটনাও ঘটে থাকে। বিয়ে সংক্রান্ত নানারকম সামাজিক আচারের মধ্যে বীরহোর নারী-পুরুষ পালন করে শিকার ও শিকারির ভূমিকা। হতে পারে এতেই বীরহোরদের দক্ষতা সবচেয়ে বেশি, তাই। আসলে প্রকৃতি এদের মজ্জায় গেঁথে বসেছে। জঙ্গল ও শিকার যে এদের সামাজিক আচার ব্যবহারেও কতখানি গভীরভাবে শিকড় গেড়ে রয়েছে তার আরও একটা বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় এদের নানারকম প্রথায়। চৌথা-চৌথি নামে বিবাহোত্তর একটি আচারের মধ্যে দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বিয়ের কদিন বাদে মেয়েটি একটি জলভরা কলসি মধুভরা পাতার পাত্রে ঢেকে গ্রামের বাইরের দিকে চলতে শুরু করবে। পিছু পিছু তার স্বামী তীর-ধনুক ও আমগাছের একটি ডাল নিয়ে অনুসরণ করবে। গ্রামের প্রান্তে এসে মেয়েটি কলসি নামিয়ে ছুটে পালাবে তার বাপের

এই তালপাতায় চাটাই বোনা হবে

বাড়ির দিকে। তার স্বামীও অমনি তীর-ধনুক নামিয়ে রেখে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে আমগাছের ডাল দিয়ে ভালোমত পেটাবে। বউকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে এবার স্বামীটি গ্রামের দিকে একটা তীর ছুঁড়বে। মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে খুঁজে বার করবে সেই তীর, স্বামীর হাতে দিয়ে মধু ও জলে মুখ ধোবে। আবার স্বামীটি সেই তীর নিজের ঘরের দিকে পাঠাবে, বউটি আবার যেমন করে হোক তা খুঁজে বার করবে। এভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না দুজনে পৌঁছাচ্ছে তাদের ঘরের সামনে। অর্থাৎ অনুষ্ঠানটির মধ্যে দিয়ে সদ্যবিবাহিত মেয়েটিকে স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হচ্ছে, যেমন শিকারি নিয়ন্ত্রণে রাখে তার শিকারকে। সামগ্রিকভাবে বীরহোর সমাজে নারীর ভূমিকা একান্তই গৌণ ; দাম্পত্য সম্পর্কেও নারী পুরোপুরি পুরুষের নিয়ন্ত্রণে, পুরুষের অনুগত।

আগেই বলেছি যে খাদ্য সন্ধানে একত্র হবার প্রয়োজনে এক একটি টান্ডা দল সৃষ্টি হয়েছে। বীরহোরদের প্রধান জীবিকা শিকারের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করা। বাঁদর ধরা এদের আর একটি প্রিয় কাজ। এই বাঁদর ধরা আর দড়ি তৈরির জীবিকা দুটি ছোটনাগপুরের অন্যান্য উপজাতিদের থেকে বীরহোরদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে। খাদ্য সংগ্রহের এই বিশেষ উপায় দুটি কীভাবে গড়ে উঠলো ? বীরহোরদের প্রাকৃতিক পরিবেশ—তার স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জীবজন্তু—যে এগুলিকে একলা নির্ধারণ করেছে তা নয়। এখানেই দেখা যায় মানুষের বুদ্ধি কীভাবে তার নিজের পথে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে কাজ করছে, এমনকি বীরহোরদের মত এক আদিম উপজাতির ক্ষেত্রেও। চোপ লতা সংগ্রহ এবং দড়ি তৈরি প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব কাজ, যেমন নিজস্ব জঙ্গল থেকে তার খাদ্য সংগ্রহ। কিন্তু "বাঁদর শিকার" বা গারি-সেন্দ্রায় একটি টান্ডার সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যোগ দেয় এবং শিকারের ভাগ পায়। বছরে একবার করে কাছাকাছি সমস্ত টান্ডার সমর্থ পুরুষেরা "আঞ্চলিক শিকার" বা ডিসুম সেন্দ্রার জন্য একত্রিত হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে এই মৃগয়া শুরু হয়, কিছুদিন আগে থেকেই তারিখ ও স্থান সম্পর্কিত তথ্য পৌঁছে যায় সকলের কাছে। এই অভিযানে মেয়েদের যোগ দেওয়া বারণ। এই বাৎসরিক শিকারের মত আরও দুয়েকটি সামাজিক ঘটনা, যেমন উপজাতি অনুশাসন ভঙ্গের মত গুরুতর সামাজিক অপরাধের ক্ষেত্রেও নিকটবর্তী বেশ কয়েকটি টান্ডার বীরহোরদের একত্র হতে দেখা যায়।

মূল জনজীবন থেকে বীরহোররা বিচ্ছিন্ন ঠিকই, কিন্তু ধীরে ধীরে এই বিচ্ছিন্নতার মাত্রা কমছে, এ-ও সত্য। নির্বিচারে গাছ কাটা ও জঙ্গল হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বীরহোরদের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা কমে যাচ্ছে। বাড়ছে বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ। টান্ডাগুলি জঙ্গলকে পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে আসছে গ্রামীণ জনবসতিগুলোর দিকে। এমনকি হাজারিবাগ শহর থেকে ন্যাশনাল পার্কের দিকে কিছুটা এগোলেই চোখে পড়বে বড় রাস্তার ধারে ছোট্ট একটি টান্ডা, যে প্রকৃতি তাদের জীবনযাত্রার ভিত্তিভূমি, তাতেই যখন ক্ষয় ধরেছে, এরকম এক সংকটের মুহূর্তে বীরহোরদের সমাজ আগের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে পারছে না। প্রকৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে এরা বাধ্য হয়েছে কতকটা, অথচ পরিবর্ত কোন জীবিকার খোঁজ এখনও পায়নি। বীরহোররা তাই এখন এক টালমাটাল সময়ে, তাদের সমাজ উত্তরণপথের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজেদের বোঝা ও জানা, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেনতার উন্মেষ হচ্ছে এই ক্ষুদ্রতম উপজাতিদের মধ্যে। এই মুহূর্তে আমাদের কী ভূমিকা হওয়া উচিত ? আমরা, তথাকথিত "সভ্য", মূল জনজীবনের স্রোতে গা ভাসানো মানুষদেরও ভাবতে হবে যে বীরহোরদের কী আমরা মিউজিয়মে সাজানো দ্রষ্টব্যবস্তু হিসেবেই চিরকাল রেখে দেবো ? অথবা চেষ্টা করবো তাদের তুলে নিয়ে আসতে নিজের পাশে ; উপযুক্ত খাদ্য, শিক্ষা, জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবার বন্দোবস্ত করবো ? আমরা কী দেখবো না যাতে পুষ্টির অভাবে বীরহোর শিশুগুলি অকালে মারা না যায় ? অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া এই মানুষগুলো কী কোনদিনই আর পাঁচজনের একজন হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে না ? হয়তো কারুর নজরই পড়বে না এদের দিকে, সংখ্যায় কমতে কমতে কালের নিয়মে নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ধুয়ে-মুছে ফেলে এরা স্থান নেবে বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজের একেবারে নীচের তলায়। উপজাতিদের সাঙ্গীকরণ ও আধুনিকীকরণ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদ্‌দের অনেক বিতর্ক আছে। তার মধ্যে না জড়িয়েও এটুকু বলতে পারি যে, বীরহোরদের সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। তা না করতে পারলে সুদক্ষ এই শিকারী উপজাতিটি শিগ্‌গীরিই অবলুপ্ত হবে।

আমাদের কী বাঁচার অধিকারও নেই ?

ছবি : লেখিকা